বাড়ির আঙ্গিনায় হরিণ পালন

প্রকৃতির এক সুন্দরতম বন্য প্রাণীর নাম হরিণ। এর রঙ-চঙা শরীর আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট আকর্ষণীয়। দেশের অধিকাংশ মানুষ যদিও হরিণ সচক্ষে দেখার সুযোগ পান না তবুও ছবির হরিণ প্রায় সকলেরই চেনা। যে শিশুটি সদ্য কথা বলতে শিখেছে সেও কিন্তু হরিণ নামের পশুটিকে শব্দে শব্দে চিনে নেয়। আর অর জ্ঞানের প্রারম্ভেই "হ"-তে হরিণ শিখে নেয় এবং রঙিন ছবির পশুটিকে তার আরো কাছে এন দেয়। হরিণ আজ আর দেশের সকল বনে-জঙ্গলে নেই। এদের আবাসমূল এখন চিড়িয়াখানায় আর সুন্দরবনে। অতি কম সংখ্যায় হলেও, তবু কিন্তু কিছু কিছু সৌখিন ব্যক্তি বাড়ির আঙ্গিনায় হরিণ পালন করে থাকেন।

বন্য প্রাণী বনাম গৃহপালিত পশুঃ

প্রাচীনকালে মানুষ তাদের ক্ষুধা নিবারনের জন্য বন্য পশু শিকার করত। সে সময় বন্য পশু শিকার নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদে ছিল, শখ বা বিনোদনের জন্য নয়। এক সাথে কয়েকটি প্রাণী ধরতে পারলে, প্রয়োজনমত জবাই করে বাকীগুলো ভবিষ্যতের জন্য গৃহে আবদ্ধ করে রাখতো। সেই ধ্যান-ধারনা থেকেই সম্ভবতঃ বন্য প্রাণী নিজ গৃহে লালন পালনের সূত্রপাত ঘটে। গৃহে আবদ্ধ বন্য প্রাণীদের মধ্যে কিছু প্রজাতি মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং মানুষের কাছে থেকেই বংশবিস্তার করতে থাকে। এ প্রসংঙ্গে পবিত্র আল কুরআনের সুরা ইয়াছিনে আলাহ পাক এরশাদ করেছেন।

"আমি চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে ওদের বশীভূত করে দিয়েছি; কতক তাদের খাদ্য আর কতক তাদের বাহন, তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না"

গরু মহিষ ভেড়া ছাগল মাংসের জন্য আর ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, হাতী বোঝা বহনের কাজে লাগানোর জন্য জঙ্গল থেকে ধরে এনে গৃহপালিত করা হয়েছে। সঙ্গত কারনেই হরিণ পালন অবাস্তব একটা ধারনা নয়।

বাংলাদেশের বন্য প্রাণী হরিণঃ

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন গাছ-পালার প্রয়োজন, তেমনি গহীন অরণ্য আর বনাঞ্চলের নীরব-শান্ত পরিবেশও বনের জীব-জন্তুদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। অরণ্যের শোভা হচ্ছে নানা জাতীয় বৃ আর উদ্ভিদ। সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমায় বৈচিত্রময় বনে নানা ধরনের পশুপাখির সমারোহ ঘটেছে। কিন্তু দূরদর্শীতার অভাব আর খামখেয়ালী চিন্তা-ভাবনার ফলে বনরাজিকে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন করে চলেছে সেরা জীব মানুষরাই। এক সময় এ দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও সিলেটে ছিল মায়াভরা ডাগর চোখের মনোমোহিন দৃষ্টির হরিণদলের স্নিগ্ধ পদচারণা।

আগে এদেশে বেশ কয়েক প্রজাতির হরিণ ছিল। তন্মধ্যে চিত্রা, সাম্বার, পারা, বারশিংগা ও মায়া হরিণ উলেখযোগ্য। অথচ বর্তমানে কেবল চিত্রা হরিণই চোখে পড়ে, তাও কেবল সুন্দরবন অথবা চিড়িয়াখানাগুলোতে। জানা যায় সিলেটের বনাঞ্চল ও চা বাগানে আগে মায়া হরিণ বিচরণ করতো। এরা নম্র স্বভাবের আর ভয় পেলেই কুকুরের মত "ঘেউ ঘেউ" করতো। অথচ এখন আর বনের মাঝে বা চা বাগানের সঙ্কীর্ন আঁকা-বাঁকা পথে এদের দেখা যায় না। চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেকেই সৌখিনতার বসে মায়া হরিণ পালন করতেন। হয়তো এমন হতে পারে অদূর ভবিষ্যতে, বর্তমানের চিত্রা হরিণও অন্যান্য প্রজাতির হরিণের মতন এ দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেহেতু চিড়িয়াখানাগুলোতে চিত্রা হরিণ অত্যন্ত সহজে পোষা সম্ভব হচ্ছে সেহেতু বসতভিটায়ও হরিণ পোষা বাস্তব দিক থেকে সম্ভব।

অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় হরিণ পালনঃ

হরিণ পালন বেশ লাভজনক। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং হাঁস-মুরগির মাংসের তুলনায় হরিণের মাংস অবশ্য অনেক বেশি ব্যয়বহুল। সম্ভবতঃ সেটা অনেকটা দুষপ্রাপ্যতার কারণেই হবে। সে সুযোগটা কাজে লাগিয়ে বসতভিটায় হরিণ পালনের মাধ্যমে আয়-রোজগার করার ধ্যান-ধারনা তাই হয়েতো অবাস্তব কিছু হবে না।

* হরিণ পালন আমাদের সমাজে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যে বাড়ীতে হরিণ পালিত হয় সে বাড়ির মালিকের পরিচিতি সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। এই পরিচিতিতে তিনি অবশ্যই আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হন মনে মনে। সেই সাথে আগন্তুক বা জনসাধারনও বিনোদনের খোরাক পান। আর বিশেষ করে ছোট ছেলে মেয়েদেরতো সীমাহীন আনন্দের উৎস হয় এই হরিণ-হরিণী।

* পশমযুক্ত হরিণের চামড়া যা ফ্যানসি স্কিন (Fancy skin) হিসাবে ঘরের দেয়ালে শোভা বর্ধন করে তার কিন্তু মূল্য যথেষ্ট। এছাড়া চামড়াজাত বিভিন্ন প্রকারের অতি মূল্যবান পণ্য তৈরিতে হরিণের চামড়া ব্যবহৃত হয়। দেশে বিদেশে ঘরের

পরিবেশ সুশোভিত করতে হরিণের ফ্যানসি চামড়া অতি কাঙ্খিত একটি উপকরণ।

* হরিণের শিং যে কতো বৈচিত্রময় ও কাব্যিক হতে পারে তার একমাত্র দৃষ্টান্ত হচ্ছে সে নিজেই। পুরুষ হরিণের এক জোড়া শিং ড্রয়িং রুমের অবরবকে আভিজাত্য আর সৌন্দর্যের আবরণে রূপময় করে তোলে। উলেখ্য যে প্রজনন ঋতুতে হরিণের মাথায় শিং গজায় এবং এক সময় তা আবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে খসে পড়ে। ফলে সখের বশে হরিণ পালন করা হলে তা থেকে প্রতি বছরই এক জোড়া শিং উপহার পাওয়া যায়।

বসতবাড়ীতে হরিণ পালন ও পরিচর্যাঃ

কৃষিভিত্তিক এদশের মানুষ বহুকাল ধরেই গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল পালন করে আসছে। তাদের এ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তৃনভোজী আলোচ্য এই আকার্ষণীয় প্রাণীটিকে লালন পালন ও পরিচর্যার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ছাগল পালনের ন্যায় হরিণ পালনও একটি সহজসাধ্য ব্যাপার। আমাদের দেশের আবহাওয়া হরিণ পালনের জন্য যথেষ্ট অনুকূল। পরিচর্যার ক্ষেত্রে তেমন কোনো জটিলতা না থাকলেও এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পশুচিকিৎসক ও পশুপুষ্টিবিদগণ সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে পারবেন। বর্তমান বিশ্ব এখন প্রযুক্তির চরম সীমায় উপস্থিতি। এমতবস্থায় হরিণ পালনকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের কাঠামোতে অন্তভূক্ত করা যায় কীনা সেটা সম্ভবতঃ ভাববার সময় এসেছে। সরকার ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা এ বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করলে হয়তো একটা দিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে।

হরিণ সংরক্ষণে প্রয়োজন গণ সচেতনতাঃ

বন্য প্রাণী হরিণ আমাদের জাতীয় সম্পদ। বর্তমানে পরিবেশ বিপর্যয়ের শিকার হয়ে এ প্রাণীর জীবন বিপন্ন হতে চলেছে। অর্থলোভী হিংস্র শিকারীদের দুর্বার আকর্ষন এখন অসহায় মায়াবী হরিণ কুলের উপর। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকহারে হরিণ শিকারের সংবাদ প্রায়শঃ দেখা যাচ্ছে যা আমাদের দেশের জন্য সত্যিই অত্যন্ত হতাশা ও উদ্বেনের বিষয়। পত্রিকান্তরে জানা যায় "শীতের শুরুতেই সংঘবদ্ধ শিকারীদের তৎপরতা শুরু হয়। অহরহ উদ্ধার করা হয় জীবিত অথবা মৃত হরিণ ও হরিণের চামড়া। সমপ্রতি হরিণ শিকারের ১ হাজার ফাঁদসহ একটি ট্রলার আটক করা হয়েছে। পূর্ব সুন্দরবনের শরনখোলা রেঞ্জের দুবলারচরে প্রতিবছর হিন্দু সমপ্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী উৎসব রাসমেলা উদযাপিত হয়ে থাকে। এই মেলাকে উপল্য করে এক শ্রেণীর দুবৃত্ত যারা শিকারী নামে অভিহিত মেতে ওঠে হরিণ শিকার যজ্ঞেও। শিকারীদের ফাঁদে আটকে পড়া হরিণের পায়ের গোড়ালীতে মারাত্মক ক্ষত হয়। মাঝে মধ্যে এসব দুষকৃতকারীদের কেউ কেউ ধরা পাড়লেও অধিকাংশই রয়ে যায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সুন্দরবনে অন্যায়ভাবে প্রতিদিন কত হরিণ শিকার হচ্ছে তার কোনো খতিয়ান পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক গুরুত্বের কারণে সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষনা করা হয়েছে। একটি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখতে সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই, অবিলম্বে সুন্দরবনের হরিণ রক্ষার পাশাপাশি দেশের চিড়িয়াখানাগুলোতে ব্যাপকভাবে হরিণের প্রজনন ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের হরিণ প্রজনন কেন্দ্রের আদলে আভয়ারণ্যগুলোতে হরিণের প্রাকৃতিক বিচরণ ভূমি সৃষ্টি করতে হবে। উৎসাহী ও অভিজ্ঞ চাষীদের মাঝে হরিণ শাবক বিলির ব্যবস্থাও নেয়া প্রয়োজন। হয়তবা সেদিন আর বেশি দূরে নয় যখন কৃষকের বসতভিটা হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগলের পাশে মায়াবী হরিণ-হরিণী কৃষক কূলের মনকে কাব্যিক করে তুলবে।

লেখক: মোঃ আনোয়ারুল কাদির

প্রশিক্ষক (পশুসম্পদ), ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, সিলেট।

তথ্যসূত্র: পোলট্রি, পশুসম্পদ ও মৎস্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'খামার'

এগ্রোবাংলা ডটকম

হরিন পালনের নীতিমালা

বনের চিত্রল হরিণ এখন থেকে ঘরে ও খামারে পোষা যাবে। তবে এ জন্য পালনকারীকে হরিণের বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এ জন্য একটি নীতিমালা অনুমোদন করেছে। এতে বন বিভাগকে হরিণ পোষার অনুমতির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য ফি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে বন বিভাগ দেশের বিভিন্ন বন অফিস থেকে হরিণ পোষার অনুমোদন দিতেও শুরু করেছে।

পরিবেশবাদীরা মনে করছেন, ঢালাওভাবে হরিণ পালনের অনুমতি দিলে এর অপব্যবহার হতে পারে। বন্য হরিণ আরও বিপন্ন হতে পারে। বাংলাদেশ বন্য প্রাণী আইন (সংরক্ষণ, সংশোধন), ১৯৭৪-এর আওতায় চিত্রল হরিণ পোষাসংক্রান্ত নীতিমালা-২০০৯ অনুমোদন করেছে সরকার। তবে চিত্রল ছাড়া অন্য কোনো হরিণ পোষা যাবে না। কেউ অন্য হরিণ পুষলে তাঁর বিরুদ্ধে বন্য প্রাণী আইনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগে বন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হরিণ লালন-পালনের অনুমোদন দিত। এ ক্ষেত্রে বন বিভাগের কাছ থেকে প্রাথমিক অনুমোদন নিতে হতো। এই নতুন নীতিমালায় চিত্রল হরিণ লালন-পালন ও ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে।

নীতিমালার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, চিত্রল হরিণ পাওয়া যায় এমন বনের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে এই হরিণ পোষা যাবে না। ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১০টি চিত্রল হরিণ পোষা যাবে। এর বেশি হলে খামার হিসেবে অনুমতি নিতে হবে। বন বিভাগ ও চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী হরিণ বিক্রি করতে পারবে। তবে হরিণ কিনতে হলে বন বিভাগের কাছ থেকে 'পজেশন সার্টিফিকেট' নিতে হবে।

পরিবেশ ও বনসচিব মিহির কান্তি মজুমদার এ ব্যাপারে বলেন, 'হরিণ পালনের জন্য নীতিমালা অনুমোদিত হলেও বন বিভাগ আপাতত কোনো হরিণ বিক্রি করবে না। দেশে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে হরিণগুলো রয়েছে, ওই হরিণগুলোকে ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতা দেওয়া হবে।'

খামার ছাড়া অন্যত্র অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে বা বাসাবাড়িতে চিত্রল হরিণ পোষার অনুমোদন ফি ধার্য করা হয়েছে ৫০০ টাকা। মহানগর এলাকায় প্রতি খামারের জন্য অনুমোদন ফি দুই হাজার টাকা। জেলা সদর এলাকায় প্রতি খামারের জন্য ফি আড়াই হাজার টাকা। অন্য এলাকায় খামারের জন্য ফি দুই হাজার টাকা। প্রতিটি হরিণের জন্য পজেশন ফি ১০০ ও নবায়ন ফি বছরে ১০০ টাকা।

খামারের হরিণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বন সংরক্ষক ও ব্যক্তিগত হরিণের ক্ষেত্রে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন দিতে হবে। হরিণ পরিণত হলে তার মাংস খাওয়া যাবে। তবে বাচ্চা প্রসব করলে বা মারা গেলে ঘটনা ঘটার ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বন বিভাগের কাছে তা জানাতে হবে। হরিণের মাংস বা কোনো অঙ্গ স্থানান্তর করতে হলেও সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে স্থানান্তর অনুমোদন নিতে হবে। কাউকে হরিণ দান করতে হলেও বন বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় দুই লাখ চিত্রল হরিণ রয়েছে। চিত্রল হরিণের মূল বসতি এলাকা সুন্দরবনে রয়েছে প্রায় দেড় লাখ। নিঝুম দ্বীপে রয়েছে ১২ থেকে ১৫ হাজার। এ ছাড়া চর কুকরিমুকরি, বাঁশখালীসহ উপকূলীয় বনে বিচ্ছিন্নভাবে হরিণের বসতি রয়েছে।

এগ্রোবাংলা ডটকম